বায়ুদূষণ প্রতিরোধে আইনী পর্যালোচনা

বার্তাপত্র জুলাই-২০২৫

২০২৩-২৪ সালে বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষ তালিকায় থাকা ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১ম।[১] বিশ্বে যত মানুষ মারা যায় তার দ্বিতীয় প্রধান কারণ বায়ুদূষণ আর এই মৃত্যুর হার দিন দিন বেড়ে চলছে।[২] প্রতি বছর ৭০ লক্ষের অধিক মানুষ বায়ুদূষণে অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করে।[৩] বাংলাদেশের বায়ু মন্ডলীয় দূষণ অধ্যায়ন কেন্দ্র (CAPS) এবং ফিনল্যান্ডভিত্তিক স্বাধীন গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রির্সাচ এনার্জি এন্ড ক্লিন এয়ার (CREA) দ্বারা পরিচালিত দুইটি পৃথক গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ২০১৬-২৪ সাল পর্যন্ত ঢাকার বায়ুরমান যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি দূষিত ছিল এবং বিশেষ করে ২০২৪ সালে দূষণের পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় ১২.৪২% বেশি ছিল এবং সে সময় বায়ুদূষণে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বার্ষিক মৃত্যু ঘটে প্রায় ৪৮%।[৪] এই গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, গত ৯ বছরে মাত্র ৩১ দিন নির্মল বায়ু পেয়েছে ঢাকাবাসী। গত বছর ঢাকার গড় বায়ুমানে সূক্ষ্ম কণার (পিএম২.৫) পরিমাণ ছিল ৭৯.৯ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার যা নয় বছরে সবোর্চ্চ এবং WHO নির্দেশিকার প্রায় ১৬ গুণ বেশি। যদিও ২০২৫ এ প্রতিদিনই পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একিউআই (AQI) স্কোর ১৭০-২০০ এর মধ্যে অবস্থান করছে যা অস্বাস্থ্যকর বা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং আর্ন্তজাতিক মানমাত্রার প্রায় ১৮ গুণ বেশি।[৫]

বিশ্বের বায়ু দূষিত দেশসমূহ

পিএম ২.৫ ঘনত্ব অনুযায়ী মানচিত্র (২০২৩)

10 Most Polluted Countries in the World in 2023

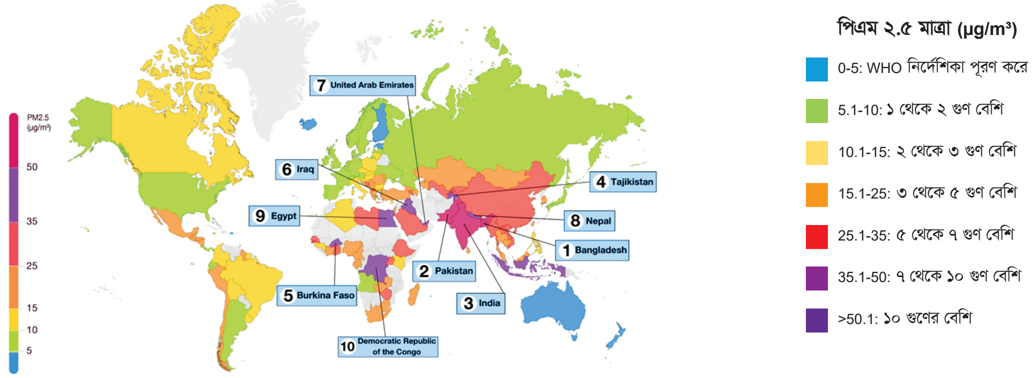

১. বাংলাদেশ
- PM2.5: >50.1 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ১০ গুণের বেশি

২. পাকিস্তান
- PM2.5: 250.1 µg/m²
- WHO নির্দেশনার ১০ গুণের বেশি

৩. ভারত
- PM2.5: 50.1 µg/m²
- WHO নির্দেশনার ১০ গুণের বেশি

৪. তাজিকিস্তান
- PM2.5: 45 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ৯ গুণ বেশি

৫. বুরকিনা ফাসো
- PM2.5: 42 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ৮.৪ গুণ বেশি

৬. ইরাক
- PM2.5: 80 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ৮ গুণ বেশি

৭. সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)
- PM2.5:36 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ৭.২ গুণ বেশি

৮. নেপাল
- PM2.5:38 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ৭.৬ গুণ বেশি

৯. মিশর
- PM2.5: 35 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ৭ গুণ বেশি

১০. কঙ্গোর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
- PM2.5: 34 µg/m³
- WHO নির্দেশনার ৬.৮ গুণ বেশি

মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি ও জৈব বস্তু পোড়ানোসহ অনেক উৎসই গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনসহ বায়ুদূষণের জন্য দায়ী যেমন- নানা ধরনের যানবাহন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কারখানা, কৃষিখাত, ইটভাটা, বর্জ্য পোড়ানো ও বাড়িতে ব্যবহৃত সব ধরনের জ্বালানিই বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয়।

---

[১] World Air Quality Report, 2023 & IQAir, 2024

[২] State of Global Air, 2024

[৩] UN Environment, 2023

[৪] CAPS & CREA report, 2024-25

[৫] DoE AQI score

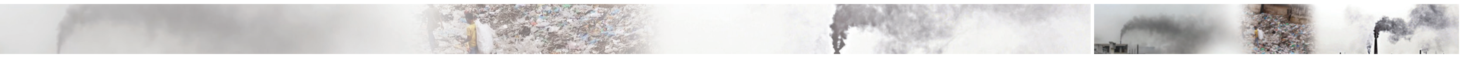

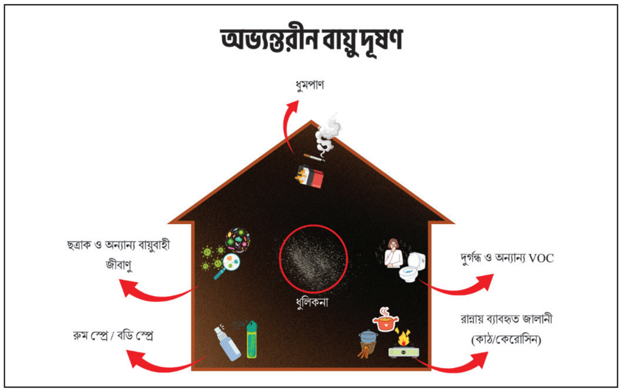

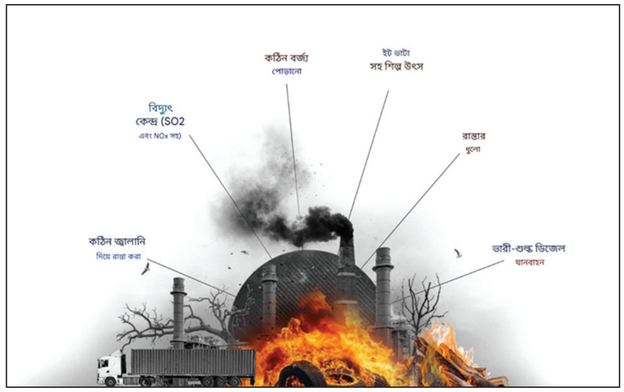

চিত্র: বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ

বায়ুদূষণ সাধারনত দুই ধরনের হয়ে থাকে - বাহ্যিক (Outdoor) ও গৃহঅভ্যন্তরীণ (Indoor) দূষণ। বাহ্যিক দূষণের মধ্যে রয়েছে- বিদ্যুৎ প্রকল্প (২৮%), ছোট-বড় আবাসন প্রকল্পের অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও রাস্তা খনন (৮%), ইটভাটা (১৩%), মোটরযান ও শিল্প (৪%) এবং আর্বজনা পোড়ানোর ধোঁয়া (১১%)। অভ্যন্তরীণ দূষণের মধ্যে রয়েছে কাঠের চুলার ধোঁয়া, কেরোসিনের চুলার ধোঁয়া, ধুমপান, গৃহস্থালির পরিষ্কারের ধুলা, এয়ার ফ্রেশনার, বায়োমাস ও অন্যান্য ধোঁয়া (৩৭%)।[৬] অবশিষ্ট বায়ুদূষণ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আগত বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, তীব্র বায়ুদূষণের কারণে ঢাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের গড় আয়ু কমেছে ৬.৯ বছর অর্থাৎ প্রায় ৭ বছর আয়ুকাল কমেছে এবং ঢাকার আশেপাশের মানুষের গড় আয়ুকাল কমেছে ৬.২ বছর। তবে সারাদেশে দূষণের মাত্রাভেদে গড় আয়ুকাল কমেছে ২.৪ বছর।[৭]

বায়ুদূষণ মূলত মানব স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। কিছু আছে স্বল্পমেয়াদী আর কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। স্বল্পমেয়াদী প্রভাবের মধ্যে রয়েছে- কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, কনজাংটিভাইটিস, এলার্জি, হাপানি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ, হার্ট ফেইলর উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দের তারতম্য। দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের মধ্যে রয়েছে- শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, আলঝাইমার, পারকিনসন্স, স্ট্রোক, মাল্টিপল স্কুলেরোসিস, বিষন্নতা, ক্রনিক কিডনী রোগ, প্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব, ত্বকের ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, ইনফ্লোমেটরি ও ইরিটেবল বাওল ডিজিজ।

সম্প্রতি একটি দৈনিক প্রত্রিকায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের রেসপিরেটরি বিভাগের একটি তথ্য প্রকাশ করে যাতে দেখা যায়, এ বছরের মার্চ মাসে এ সংক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে।[৮] The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), 2025 প্রতিবেদনে বলা হয়, বায়ুদূষণ

[৬] Bangladesh National Air Quality Management Plan (2024-30)

[৭] Air Quality Life Index, 2025

[৮] প্রথম আলো, ২৫ মার্চ, ২৫

নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বাংলাদেশে বছরে ১০২,৪৫৬ জনের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতো। উপরন্তু, বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর ৯,৪৮৫ জন অপরিণত শিশুর জন্ম হয় এবং ৬,৯৬,৩৮৯ জন শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়। এছাড়া ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ এই বায়ুদূষণ। মৃত্যুর প্রভাব ছাড়াও বায়ুদূষণে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে যার প্রভাব সরাসরি অর্থনীতিতে পড়ে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, বায়ুদূষণে প্রতি বছর প্রায় ১১.৫ বিলিয়ন থেকে ১৩ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয় যাতে জিডিপির ক্ষতি ৩.৯%- ৪.৪%।[৯] নিম্নে সিপিডির Reducing Air and Plastic Pollution, 2023 শীর্ষক এক গবেষণায় বায়ুদূষণের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় তুলে ধরা হলো-যা সরাসরি দেশের জিডিপিতে প্রভাব ফেলে।

বায়ুদূষণ মানব স্বাস্থ্যের উপর যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি প্রকৃতির উপরও বায়ুদূষণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণগুলিও বায়ুদূষণ আরো বাড়িয়ে দেয়। যেমন-ক্ষরা দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে ভূমি শুষ্ক হয়ে যায়, যা ধুলি-ঝড় হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বায়ুতে নাইট্রোজেন-অক্সাইডের দূষণ বেড়ে যায়। যানবাহনে জ্বালানি পোড়ানোর ফলেও বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন-অক্সাইড নির্গত হয় যা সূর্যের আলোর সাথে মিশে ওজোন গ্যাস উৎপন্ন করে। এছাড়া সালফার-ডাই-অক্সাইড বায়ুর আর্দ্রতা বাড়ায় যা

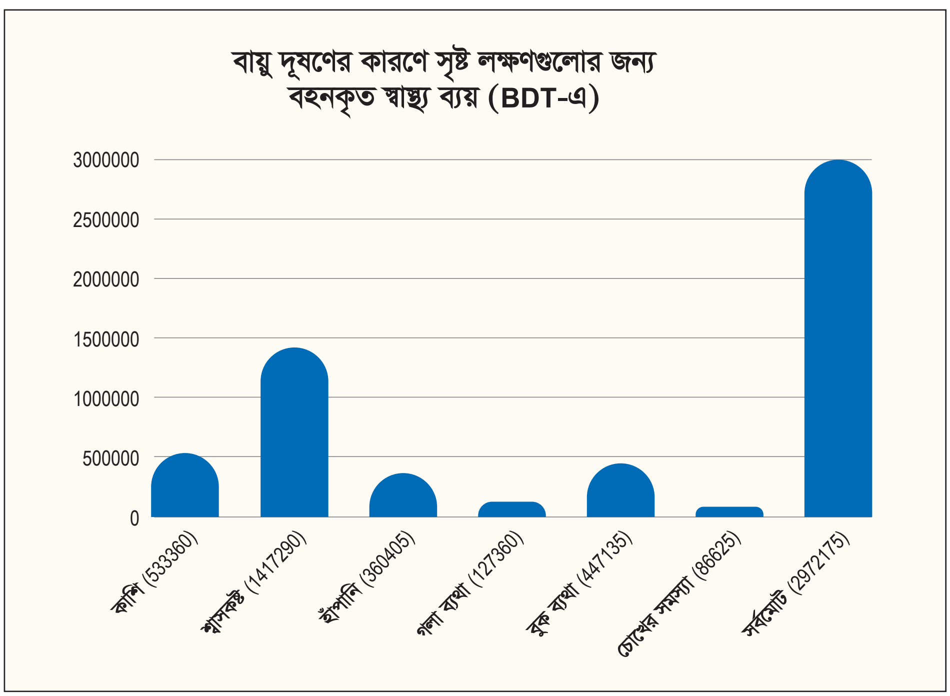

এসিড বৃষ্টির প্রধান কারণ। ইটভাটা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর কার্বন-মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় ফলে বায়ু দূষিত হয়ে পড়ে আর এসবই প্রকৃতির উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাব।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন ও নীতিমালা- আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপট

বায়ুদূষণ এখন বিশ্বের অন্যতম বড় জনস্বাস্থ্য সংকট। শিল্পায়ন, যানবাহনের নির্গমন, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার এবং দ্রুত নগরায়নের ফলে এই সমস্যা দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অনেক উন্নত দেশ ইতোমধ্যেই দূষণ কমানোর জন্য কার্যকরী আইন, নীতিমালা ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন-

- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২৪ সালে "Ambient Air Quality Directive" সংশোধন করেছে, যেখানে PM2.5 ও NO2 নির্গমনের মান কঠোরভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্য হলো-২০৩০ সালের মধ্যে WHO এর মান অর্জন করা।
- যুক্তরাজ্য Environment Act, 2021 অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে Clean Air Zones & Ready to Burn জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণ কমানোর ব্যবস্থা নিয়েছে।[১০]
- যুক্তরাষ্ট্র বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান আইন হলো Clean Air Act (CAA), 1990 (সংশোধিত)। এই আইনে ৬টি প্রধান দূষণকারী পদার্থ নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। যেসব অঞ্চল এই মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হয় সেগুলোকে "নন-অ্যাটেনমেন্ট এরিয়া" বা বায়ুর মান অর্জনে ব্যর্থ অঞ্চল ঘোষণা করা এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার বিধান করা হয়।
- জার্মান শিল্প ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে "TA Luff & Federal Emission Control Act এর মাধ্যমে প্রতিটি

[৯] World Bank report, 2019
[১০] The Guardian, 2024

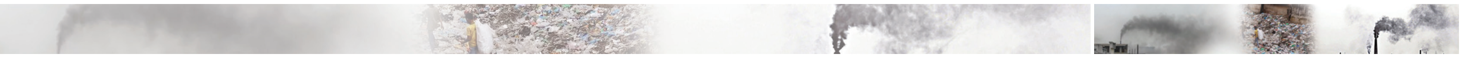

কারখানায় Best Avialable Techniques (BAT) বাধ্যতামূলক করেছে যা বায়ুদূষণ হ্রাসে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণ কমাতে Low Emission Zones চালু করা হয়েছে যেখানে উচ্চ দূষণকারী যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ফলে PM- এর মাত্রা ১০-১৫% হ্রাস পেয়েছে। জার্মান আদালত সরকারকে পরিবেশ আইন আরো কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়। ফলে জার্মানীর শহরগুলোতে বায়ুর গুণগতমান পূরণে সক্ষম হয়েছে এবং সেখানকার জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।[১১]

- ফিলিপাইনসে Clean Air Act, 1999 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান আইন এবং এই আইনে শিল্প, যানবাহন, জ্বালানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নির্গমন সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্গমন নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলকভাবে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
- মালয়শিয়া বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে Environmental Quality Act, 1978 প্রণয়ন করেছে। আইনে পরিবেশ সংবেদনশীল এলাকার ও বিভিন্ন স্থাপনার ধরণ অনুযায়ী নির্গমন মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যাতে যানবাহন থেকে ধোঁয়া নির্গত হলে ধোঁয়ার ঘনত্ব অনুযায়ী সাথে সাথেই এ্যালার্ম বেজে উঠে।
- ভারত ও চীন দ্রুত শিল্পোন্নত দেশ হওয়ায় সেখানে বায়ুদূষণের মাত্রা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগজনক। তবে আইনি কাঠামো ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করছে। Emission Trading System চালু করে শিল্পখাতে নির্গমন কমানো হচ্ছে, ইটভাটায় বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার ও উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তন করা হয়েছে, যানবাহনে নির্গমন মান কঠোর করা হয়েছে এবং শহরভিত্তিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। এভাবে তারা দূষণ কমানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন ও নীতিমালা - জাতীয় প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষা ও দূষণ সংক্রান্ত প্রায় দুই শতাধিকেরও বেশি আইন ও বিধিমালা রয়েছে হবে আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার অভাব এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক)-অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেশের সকল বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকের জন্য বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা, মান উন্নয়ন করা, বন্যপ্রাণী, বন, জলাশয় ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা। এই ধরনের সাংবিধানিক বিধান পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহায়ক তবে ১৮ (ক)-অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সরাসরি আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩২ এ জীবনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্ট ইতোমধ্যে বেলা'র দায়েরকৃত মামলায়[১২] নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারকে জীবনের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই অনুচ্ছেদের অধীনে জীবনকে অর্থবহ করতে স্বাস্থ্য, জীবন-যাত্রার মান ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নিরাপদ পরিবেশও এর অন্তর্ভুক্ত যেখানের পরিবেশের সকল উপাদান সঠিকমাত্রায় থাকবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ একটি মাইলফলক। এই আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পরিবেশকে একটি স্বতন্ত্র আইনি বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই আইন অনুযায়ী, দূষণ বলতে বোঝায় পরিবেশের উপাদানগুলো যেমন- বায়ু, পানি, মাটির বৈশিষ্ট্যের রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলীর পরিবর্তন ও দূষণ অথবা এই উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের এমন সংযোজন বা উপস্থিতি যার প্রভাবে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, জীববৈচিত্র্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৩] দূষণ শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। তাই আইন অনুযায়ী দূষণ

---

[১১] Reutters, 2024

[১২] Writ Petition No-92/1996 (Radiated Milk)

[১৩] ধারা ২(খ), বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

রোধ এবং নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনে দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ক্ষমতায়ন করে দূষণকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা, কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া বা কারাদণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance Certificate) ছাড়া কোনো শিল্প বা অবকাঠামো প্রকল্প পরিচালনাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে এই আইনে স্পষ্ট বিধান রয়েছে[১৪] উপরোক্ত বিধান লঙ্ঘিত হলে ক্ষেত্রমতে, ৫ হাজার-অনধিক ২ লক্ষ টাকা বা অনধিক ১-২ বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এছাড়া প্রতিবেশ ব্যবস্থা কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যক্তি বাধ্য থাকবে, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৫] এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আবেদনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে এবং গণ-শুনানির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ দাবি নিস্পত্তি করতে পারবে।[১৬] পরিবেশ দূষক নির্গমনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমনে বাধ্য থাকবে, এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষও সে বিষয়ে অবগত হলে দ্রুত প্রশমনের নির্দেশ দিতে পারেন এবং প্রতিকারমূলক ব্যয় আদায়যোগ্য হবে।[১৭] আইন লঙ্ঘন করলে ক্ষেত্র বিশেষে ১-২ বছর কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার-১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই আইন পরিবেশগত ন্যায়বিচারের (environmental justice) ভিত্তি তৈরি করেছে ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের দায়িত্বকে স্পষ্ট করেছে। তবে আইনটির বাস্তব পর্যায়ে প্রয়োগ এখনও অনেকাংশে সীমিত বিশেষত, বায়ুদূষণকারী যানবাহন ও ইটভাটার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে আইন প্রয়োগের সক্ষমতা দুর্বল।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন কার্যকর বিধিমালা। আর সেই উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩। এই বিধিমালায় বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, শব্দ ও মাটিসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য হানিকর ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী মোটরযান বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধিও রাখা হয়েছে।[১৮] ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধান রেখে অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো কাজ চলাকালে যদি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তবে দায়ী ব্যক্তি, কারখানা বা প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হবে এবং আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা সময়মতো না দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত ছাড়পত্র (সাইট ক্লিয়ারেন্স) বা পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইআইএ ক্লিয়ারেন্স) স্থগিত, বাতিল অথবা আর নবায়ন করা হবে না মর্মে বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] এই বিধিমালা বাংলাদেশে আধুনিক পরিবেশ মানদন্ডের সূচনা করেছে। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে নির্গমন নিয়ন্ত্রণের বিধান থাকায় এটি বৈশ্বিক নীতি ও প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সমস্যা হলো বিধিমালার কারিগরি দিক বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম, দক্ষ জনবল ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে উভয় পরিবেশে ইটভাটা একটি বড় দূষণকারী খাত। প্রচলিত ফিক্সড চিমনি কিলন থেকে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া ও ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয়, যা সরাসরি বায়ুদূষণের সাথে সম্পর্কিত। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনটি প্রণীত হয়েছে যার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাবে না;[২০] এবং ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;[২১] ইটভাটা হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে;[২২] জনবসতিপূর্ণ এলাকা, কৃষিজমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা

---

[১৪] ধারা ৬, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
[১৫] ধারা ৭, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
[১৬] ধারা ৮, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
[১৭] ধারা ৯, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
[১৮] বিধি ৩, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩
[১৯] বিধি ৪, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩
[২০] ধারা ৬, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
[২১] ধারা ৭, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
[২২] ধারা ৭ক, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

কেন্দ্রের কাছে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে;[২৩] নিষিদ্ধ এলাকার অভ্যন্তরে ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন আইনের অধীন কোনরূপ অনুমতি বা লাইসেন্স বা ছাড়পত্র প্রদান করতে পারবে না।[২৪] আইন লঙ্ঘন করলে ক্ষেত্রবিশেষে অনধিক ১-৫ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১-৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[২৫] এই আইন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলেও বাস্তবে ইটভাটার একটি বড় অংশ অবৈধভাবে পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্বল মনিটরিংয়ের কারণে আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবে দীর্ঘমেয়াদে এই আইন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদনে উৎসাহ দিয়েছে।

পরবর্তীতে, পরিবেশ অধিদপ্তর শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ সারা দেশে যানবাহন, ইটভাটা, নির্মাণকাজ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বায়ু, মাটি, পাথর, ইট ও বর্জ্য উন্মুক্তভাবে পরিবহনের মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা (স্মারক নং-২২.০২.০০০০.০২৬.২৬.৩২.১৯-২৮৪) প্রণয়ন করে এবং বায়ুর গুণগত মান রক্ষার্থে সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরীক্ষা করে সে মোতাবেক চলার জন্য জনসাধারণকে কিছু পরামর্শ দিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি (স্মারক নং-২২.০২.০০০০.০১২.৫৩.০১১.১৫.২৩৩) জারি করে।

The Motor Vehicles Rules, 1940

যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া নগর বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। এই বাস্তবতা বিবেচনায় এনে যানবাহনের নির্গমন নিয়ন্ত্রণের বিধান করে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি মোটরযান এমনভাবে তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তায় চালানো এবং ব্যবহার করা হবে যাতে, সেখান থেকে কোন অতিরিক্ত ধোঁয়া, দৃশ্যমান বাষ্প, কাদা স্ফুলিঙ্গ, ছাই বা কোন তৈলাক্ত পর্দাথ নির্গমন না হয় যা নির্গমনে কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে বা রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।[২৬] এই আইন যানবাহন খাতের দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর একটি কাঠামো দিয়েছে। তবে গাড়ির ফিটনেস টেস্ট, নির্গমন পরিমাপের প্রযুক্তি এবং সড়ক পরিবহন খাতের দুর্নীতি আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশ দূষণকারী ধোঁয়া নির্গমন বা নিঃসরণ এর মাত্রা নিধার্রণ করা হবে মর্মে এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭] পরিবেশ দূষণকারী কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ মোটরযানে স্থাপন, পুনঃস্থাপন বা ব্যবহার করা যাবে না[২৮] এবং ত্রুটিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন চালানোর অনুমতি প্রদান করা হবে না।[২৯] এই আইন লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ১-৩ মাসের কারাদণ্ড ও ৫-২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৩০]

বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২

এই বিধিমালা অনুযায়ী, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর সময়ভিত্তিক একটি জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে;[৩১] বায়ুদূষণকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তালিকা প্রকাশ করতে পারবে; তালিকাভুক্ত বায়ুদূষণকারী দূষণরোধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্বলিত পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে।[৩২] শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত বিনির্দেশ (Specification) অনুসারে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Air Pollution Control System) বাস্তবায়ন করবে ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের সকল ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করবে।[৩৩] যানবাহনের জন্য নির্দিষ্ট নির্গমন মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩৪] স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণকার্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বায়ুমান নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত কর্মপদ্ধতিসমূহ

---

[২৩] ধারা ৮(১), ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
[২৪] ধারা ৮(২), ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
[২৫] ধারা ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
[২৬] বিধি ১২৪, The Motor Vehicles Rules, 1940
[২৭] ধারা ৪৬(১), সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮
[২৮] ধারা ৪৬(৩), সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮
[২৯] ধারা ৪৬(৪), সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮
[৩০] ধারা ৮৯, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮
[৩১] বিধি ৪, বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২
[৩২] বিধি ৬ (১, ২, ৩), বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২
[৩৩] বিধি ৮, বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২
[৩৪] বিধি ৯, বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২

অনুসরণ করবে ও অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের সময় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।[৩৫] বর্জ্য হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ রোধে খোলা অবস্থায় বর্জ্য সংরক্ষণ বা পোড়ানো যাবে না।[৩৬] বিশেষত অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) পরিস্থিতিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩৭] উল্লেখিত বিধিসমূহের লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[৩৮]

সম্প্রতি বায়ুদূষণের মাত্রা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ অনুসারে ঢাকার সাভার উপজেলাকে **'ডিগ্রেডেড এয়ারশেড'** এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে পরিপত্র জারি করে। এক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর থেকে "টানেল এবং হাইব্রিড হফম্যান ইটভাটা" ছাড়া সকল ইটভাটা বন্ধ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি উন্মুক্ত অবস্থায় বর্জ্য পোড়ানো নিষিদ্ধ এবং নতুন করে দূষণকারী শিল্পকারখানার অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

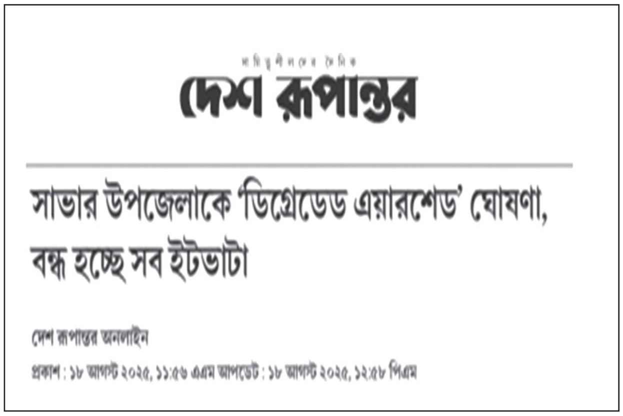

দেশ রূপান্তর

সাভার উপজেলাকে 'ডিগ্রেডেড এয়ারশেড' ঘোষণা, বন্ধ হচ্ছে সব ইটভাটা

দেশ রূপান্তর অনলাইন

প্রকাশ : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৬ এএম আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৮ পিএম

'টানেল' ও 'হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন' ছাড়া সাভারের সব ইটভাটা বন্ধ হচ্ছে

পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সাভারের বায়ুর বার্ষিক মানমাত্রা জাতীয় নির্ধারিত মানমাত্রার প্রায় তিন গুণ বেশি।

ফাইল ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published : 18 Aug 2025, 12:56 PM

বিধিমালাটি বাংলাদেশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে, যেখানে প্রযুক্তিগত সমাধান ও নির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তবে বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পর্যাপ্ত মনিটরিং যন্ত্রপাতি, ল্যাব সুবিধা ও দক্ষ জনবল-এর অভাব। AQI পর্যবেক্ষণ ও তথ্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে আধুনিক অবকাঠামো এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। ফলে নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী হলেও এর কার্যকারিতা নির্ভর করছে বাস্তবায়ন সক্ষমতার ওপর।

এছাড়াও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইনসমূহ সরাসরি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন না হলেও, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এদের ভূমিকা রয়েছে। কারণ বায়ুদূষণ মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্যাধিকারে আঘাত হানে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ নাগরিকদের ক্ষতিপূরণ দাবি করার সুযোগ দিয়েছে। ফলে দূষণের কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হলে তা নিয়ে মামলা করা যায়। এর ফলে আইনগতভাবে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে একটি নতুন পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

বায়ুদূষণ রোধ নির্দেশিকা, ২০২০

মহামান্য আদালতে দায়েরকৃত একটি রীট মামলায়[৩৯] ঢাকার আশেপাশের বায়ুদূষণের কারণ এবং দূষণ রোধে একটি কমিটি গঠন এবং কমিটি কর্তৃক নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়কে জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ুদূষণ রোধে নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ধাপে ধাপে ২০২৫ সালের মধ্যে যানবাহন, শিল্প, নির্মাণসহ বিভিন্ন খাত থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ ১০০% নিয়ন্ত্রণ করা। নির্দেশিকায় খাতভিত্তিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেমন-

- ইটভাটা খাতে পরিবেশবান্ধব ব্লক তৈরিতে প্রণোদনা, সরকারি কাজে বাধ্যতামূলক ব্লক ব্যবহার ও জনসচেতনতা সৃষ্টির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধন ২০১৯) এর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে নিয়মিত অভিযান ও অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

[৩৫] বিধি ১০, বায়দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২

[৩৬] বিধি ১২, বায়দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২

[৩৭] বিধি ১৫, বায়দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২

[৩৮] বিধি ১৭, বায়দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২

[৩৯] Human Rights & Peace for Bangladesh Vs others (916/2019)

- শিল্প ও নির্মাণ খাতে ধূলা নিয়ন্ত্রণ, অস্থায়ী বেষ্টনী, সকল নির্মাণ সামগ্রী উন্মুক্ত অবস্থায় না রাখা, পানি ছিটানো, নির্মাণ সামগ্রী ও বর্জ্যের সঠিক পরিবহন, উন্নয়ন কার্যক্রমের সময়সীমা নির্ধারণ, নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রম করলে জরিমানা এবং একইসাথে ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা, ভবন ও রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে দরপত্রে "Environmental Pay System" চালুর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- যানবাহন খাতে ধাপে ধাপে পুরনো যানবাহন প্রত্যাহার, নির্গমন পরীক্ষা জোরদার করা, সড়কে ক্ষুদ্র অ্যাসফল্ট প্লান্ট স্থাপন এবং দূষণ কমাতে হাইব্রিড/ইলেকট্রনিক গাড়ি আমদানি ও ব্যবহারে প্রণোদনা প্রদান করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, মহাসড়ক ও যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাপনায় ধুলা ও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত রাস্তা পরিষ্কার ও গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জনসচেতনতা তৈরির জন্য গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করার দিকনির্দেশনাও এই নির্দেশিকায় রয়েছে।
- নগর ব্যবস্থাপনা খাতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বায়ুদূষণ প্রবণ (Hot spot) এলাকায় ধূলা নিয়ন্ত্রণের জন্য Dust Sucker, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ট্রাক ও পানি ছিটানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন সার্ভিস ফ্যাসিলিটিস (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস) মেরামত বারবার না করে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সকল কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খোলা জায়গায়, রাস্তার পাশে বর্জ্য পোড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বায়ুদূষণ সংক্রান্ত বেলার দায়েরকৃত মামলাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হলো-

ড. মহিউদ্দীন ফারুক বনাম বাংলাদেশ নামক যুগান্তকারী মামলায় (৩০০/১৯৯৫) বেঙ্গল মোটরযান বিধিমালা ১৯৪০ এর বিধি ১১৪ (ডি) ও মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা-১৩৯ অনুযায়ী মোটরগাড়ি থেকে উদ্ভূত কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চ শব্দযুক্ত হর্ণ অপসারণের জন্য মহামান্য আদালতের নিকট প্রতিকার চাওয়া হয়। মামলাটি শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট এই ধরনের উচ্চ শব্দযুক্ত হর্ণ অপসারণের জন্য ৩০ দিনের সময় দিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা জারি করেন। এছাড়া মহামান্য আদালত বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটিকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ৫টি যানবাহন পরিদর্শন কেন্দ্রে ৬ মাসের মধ্যে সকল যানবাহনের পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফিটসেন সনদ প্রদান করে। সেই সঙ্গে ঢাকা মহানগরীর অধীন সকল সরকারি মালিকানাধীন ডিজেল ও পেট্রোল চালিত যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করারও নির্দেশ দেন। একইসাথে আদালত আরো নির্দেশ দেন, ২০০২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা শহরে প্রয়োজনীয় সিএনজি (CNG) স্টেশন স্থাপন করা।

এছাড়া ২০০১ সালের জুলাই থেকে সকল মোটরযানে ক্যাটালিক কনর্ভাটার এবং ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন বাধ্যতামূলকসহ ২০০২ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়ামের মান নির্ধারণ করা যাতে বিষাক্ত ও ক্ষতিকর উপাদানসমূহ কমিয়ে আনা যায়। এছাড়া আদালত আরো নির্দেশ প্রদান করেন যে, ২০০২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সকল ২ স্ট্রোক (Two Stroke Engines) থ্রি-হুইলার বাতিল করা অন্যথায় লাইসেন্স প্রদান বন্ধ এবং সেপ্রেক্ষিতে পুরোনো বেবী ট্যাক্সির লাইসেন্সসমূহ বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে, আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে, এই মামলা পর্যবেক্ষণের জন্য মুলতবি রাখা হয় এবং প্রতিকার হিসেবে আদালতের নির্দেশনাসমূহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে টানা ১ মাস ধরে প্রতি সপ্তাহের ২ দিন প্রচারের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এই নির্দেশনাগুলোর কার্যক্রম ও ফলাফল সর্ম্পকে প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রতিবেদন দাখিল করার প্রস্তাব করা হয়।

উপরোক্ত নির্দেশনাগুলো এখনও চলমান রয়েছে।

ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি **(বেলা)** জনস্বার্থমূলক আরো একটি মামলা (নং ২০১৪/২০২২) দায়ের করে। এই মামলায় একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুর মান উন্নয়নের নির্দেশ প্রদান করেন মহামান্য আদালত। সেইসাথে বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা হ্রাসের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অস্বাস্থ্যকর, অতি অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক বায়ু থেকে জনসাধারণকে রক্ষায় এলার্ট সিস্টেম চালুর নির্দেশ প্রদান করেন। আদেশ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন আদেশ প্রাপ্তির ৪ মাসের মধ্যে আদালতে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।

আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা স্বত্ত্বেও অস্বাস্থ্যকর, অতি অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক বায়ু থেকে জনসাধারণকে রক্ষায় এলার্ট সিস্টেম চালু না হওয়া আদালতের আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও আদালত অবমাননার শামিল বিধায়, বেলা পুনরায় ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ও সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; মহাপরিচালক ও পরিচালক (মনিটরিং এণ্ড এনফোর্সমেন্ট), পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর আদালত অবমানানার নোটিশ প্রেরণ করে। প্রেরিত এ নোটিশের মাধ্যমে বেলা ঢাকার বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর, অতি অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক পর্যায়ের ক্ষেত্রে আদালতের আদেশ অনুযায়ী এলার্ট সিস্টেম চালু ও বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমূহ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি জানায়।

বেলার চিঠি ও পরবর্তী আইনী ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার এলার্ট সিস্টেম চালু করে।

জাতীয় বায়ুগুণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NAQMP) ২০২৪-২০৩০

বায়ুর মান উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত ও বৈজ্ঞানিক রোডম্যাপ নির্ধারণের লক্ষে সরকার জাতীয় বায়ুগুণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এটি একটি কৌশলগত দলিল, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বায়ুমানকে WHO-এর মানদণ্ডের কাছাকাছি আনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আইনী কাঠামোগুলো জোরদার এবং খাতভিত্তিক দূষিত বায়ু নির্গমণ মান নির্ধারণ ও পুরোনো যানবাহন অপসারণ নীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।

আইনী পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনসমূহ একটি বহুমাত্রিক কাঠামো তৈরি করেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু আইন মূল কাঠামো প্রদান করেছে (যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫), কিছু আইন খাতভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ এনেছে (যেমন- ইটভাটা আইন ২০১৩ ও মোটরযান আইন ২০১৮), আবার কিছু বিধিমালা কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে (যেমন- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২)। সর্বশেষে, জাতীয় বায়ুগুণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NAQMP 2024–2030) দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

বাংলাদেশের আইন কাঠামোর অন্যতম বড় শক্তি হলো সমন্বিত বিধান। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পরিবেশ অধিদপ্তরকে ক্ষমতায়ন করেছে; সেই ক্ষমতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে; আবার দূষণের উৎসভিত্তিক আলাদা আইন (ইটভাটা আইন, মোটরযান আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে আইনগুলো পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যও একটি বড় ইতিবাচক দিক। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২-এ WHO-এর AQI গাইডলাইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি শুধু দেশীয় নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি (যেমন- প্যারিস চুক্তি, SDG-13) পূরণেও সহায়তা করে।

তবে আইন কাঠামোর কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

- **প্রয়োগের দুর্বলতা:** আইনে শাস্তির বিধান থাকলেও বাস্তবে তা সচরাচর প্রয়োগ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ইটভাটা আইনে অবৈধ ভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অনেক সময় ভাটা চালু থাকে।
- **প্রশাসনিক দুর্বলতা:** পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল সীমিত এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা কম। ফলে নিয়মিত মনিটরিং সম্ভব হয় না।

- **বিচারিক সীমাবদ্ধতা:** আদালতে পরিবেশ বিষয়ক মামলা তুলনামূলক কম এবং যেসব মামলা করা হয় সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন দুর্বল। যদিও হাইকোর্ট বিভিন্ন সময়ে পরিবেশগত রায় দিয়েছে (যেমন- যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনা) কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হয় না।
- **কারিগরি মানদণ্ডের অভাব:** Emission test বা AQI পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ল্যাব, যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। ফলে আইন থাকলেও বৈজ্ঞানিকভাবে দূষণ পরিমাপ সবসময় সম্ভব হয় না।

আইনগত কাঠামোকে আরও কার্যকর করতে কিছু পদক্ষেপ জরুরি:

- কার্যকর প্রয়োগ: আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। শাস্তির ধারা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি: AQI মনিটরিং, emission test ইত্যাদির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ প্রয়োজন।
- স্থানীয় সরকারের ভূমিকা: শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উপর নির্ভর না করে স্থানীয় সরকারকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতায়ন করতে হবে।
- বিচারিক প্রতিকার: পরিবেশ আদালতকে (Environmental Court) আরও সক্রিয় করতে হবে, যাতে নাগরিকরা দ্রুত প্রতিকার পায়।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: বায়ুদূষণ একটি সীমান্ত-অতিক্রমী সমস্যা। তাই ভারত ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে যৌথভাবে আঞ্চলিক আইনি কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বায়ুদূষণ মূলত আইন প্রয়োগহীনতার নির্দেশন। বায়ুদূষণ রোধে বহু প্রয়োগিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও রয়েছে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব ও উদাসীনতা। বায়ুদূষণ শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয় বরং অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত এবং আর্ন্তজাতিক ন্যায্যতারও বিষয়। এখন প্রয়োজন এই আইনগুলোর সমন্বিত প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় নজরদারি এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। তবেই বায়ুদূষণ কমানো সম্ভব হবে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার - একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার বাস্তবায়িত হবে।

এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয় কিছু সুপারিশমালা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১) গাড়ির ধোঁয়া থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাড়ির নিয়মিত নির্গমন পরীক্ষা করতে হবে এবং সেগুলোর ডাটাবেস করা বাধ্যতামূলক করতে হবে মনিটরিং করার সুবিধার্থে;

২) দূষণ কমাতে যানবাহনকে শিফটিং ব্যবস্থায় আনা যেতে পারে এবং হাইব্রিড গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কমিয়ে দেয়া যেতে পারে;

৩) বায়ুদূষণ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রতিদিন ২ বার রাস্তাগুলোতে পানি ছিটানোর বিধান কার্যকরী করা;

৪) কার্বন ট্যাক্স আরোপের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে শহরগুলোর কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পায়;

৫) ইটভাটায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দূষণ কমাতে হবে এবং পুরোনো ইটভাটা বাতিল করতে হবে;

৬) নির্মাণ এলাকাগুলোতে আইনানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশনা প্রদান;

৭) কঠিন জ্বালানি ও কয়লা ব্যবহার থেকে সরে এসে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা;

৮) টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা ও পরিবহন কাঠামোতে অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে গণ-পরিবহন বাড়ানো;

৯) অবৈধ ব্যাটারী কারখানাগুলো বন্ধ ও কঠোর নজরদারির আওতায় আনা;

১০) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর মানদণ্ড প্রদান এবং নজরদারির আওতায় আনা;

১১) উন্মুক্তভাবে বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়ন, পুর্নব্যবহার ও বর্জ্য থেকে জ্বালানি প্রকল্পে বিনিয়োগ;

১২) নির্দিষ্ট এলাকায় দূষণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সর্তকবাতা জারির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং জনসচেতনতায় তাৎক্ষণিক তথ্য সরবারাহ করা;

১৩) দেশের শহর এলাকাগুলোতে বেশি বেশি দেশি গাছ লাগানো এবং পর্যাপ্ত জলাধারের ব্যবস্থা করা;

১৪) পরিবেশ বিষয়ক ও টেকসই জীবনধারার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বেশি বেশি প্রচার করা;

১৫) পরিশেষে, বায়ুদূষণ সংক্রান্ত গবেষণা বাড়ানো এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

গবেষণা প্রত্রটি প্রস্তুত করেছেন-

তাসলিমা ইসলাম
প্রধান নির্বাহী (বেলা) ও

রেহমুনা নূরাইন
কো-অর্ডিনেটর, রিসার্চ, এডভোকেসি ও ক্যাম্পইন (বেলা)

সহযোগিতায়-

রাইসুল হাসান হৃদয়, গবেষণা ও তথ্যসংরক্ষণ কর্মকর্তা (বেলা)
নূসরাত ফাতিমা পূর্ণতা, ইন্টার্ন, বেলা
মাইশা জাহিন ইসলাম, ইন্টার্ন, বেলা
সায়েন সাবাবা সায়েবা, ইন্টার্ন, বেলা

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)
বাড়ি নং ১৫/এ (৫ম তলা), সড়ক নং ৩, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৫৮৬১ ৪২৮৩, ৫৮৬১ ০৩১১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৮৬১ ২৯৫৭
E-mail: bela@bangla.net, Website: www.belabangla.org